তারা আদৌ ঈমানদার নয়; বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ধোঁকা দিচ্ছে না।

এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও ধোঁকা। একথা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্কে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে পারবে, বরং রাসূল (সা) এবং মুসলমানদের সাথে ধোঁকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করছে। (কুরতুবী)

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোঁকা ও ফেরেবের উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোঁকা ও ফেরেব থেকে নিরাপদ। কারো পক্ষে তাঁদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর পতিত হতো। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (র) বলেন,—যেভাবে অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অন্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে, যা আত্মিক ও শারীরিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমত এ থেকে স্বীয় স্রষ্টা-পালনকর্তার না-শুকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। এতদসঙ্গে মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা—এ দ্বিতীয় ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফিকদের শারীরিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিবারাত্র এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক তথা শারীরিক ব্যাধিই বটে! তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্য-ভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব সময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

"আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।" এর অর্থ এই যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ্ তো দিন দিন তার দ্বীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তাঁরা দিন দিন শুধু হিংসার আগুনে দগ্ধিভূত হয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা ফেতনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে—اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ—অর্থাৎ, অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এ স্থলে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। মুফাসসিরগণ এতে একমত। কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য; যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের কষ্টি পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টি-পাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারকে মু'মিন বলা চলে না। এর বিপরীত যত ভাল কাজই হোক না কেন আর তা যত নেক-নিয়্যতেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্র নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকগণ সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা গোমরাহ-দেরকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণত বোকা, অশিক্ষিত প্রভৃতি আখ্যাই জুটে

থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

সপ্তম আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি,—মুসলমানদের সাথে একটু রহস্য এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

অষ্টম আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবপক্ষে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নবম আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে নিকট হতে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে কোর-আনে তেজারতের সাথে তুলনা দিয়ে জানানো হয়েছে যে, তাদের তেজারতের যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফরকে ক্রয় করেছে।

শেষ চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু' শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের নিকট থেকে জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। ঈমান ও ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে, কখনো প্রকৃত মু'মিন হতে ইচ্ছা করত, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা হতে বিরত রাখত। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করত।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র নাগালের উর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাস'আলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা—

কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনও আছে ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়ত, এই যে, তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পাওয়া।

হুযুর (সা)-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথাবার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবীদার হয়, কিন্তু কার্যকলাপে হয় তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে। এ সমস্ত মুনাফিককে কোরআনের ভাষায় 'মুলহিদ'ও বলা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا -

হাদীস শরীফে এসব লোককে 'যিন্দীক'ও বলা হয়েছে। যেহেতু এসব লোকের কুফরী দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাই এরা অন্যান্য কাফেরের ন্যায় একই হুকুমের আওতাভুক্ত। এদের জন্য স্বতন্ত্র কোন হুকুম নেই। এ জন্যই এক শ্রেণীর লোক এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রাসূল (সা)-এর তিরোধানের পর মুনাফিকদের ব্যাপার শেষ হয়েছে। সুতরাং এখন যারা মুসলমান নয়, তারা সরাসরি কাফের বলেই পরিচিত হবে।

বুখারী শরীফের শরাহ্ 'উমদা'তে হযরত ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা)-এর পরেও মুনাফিকদের পরিচয় করা যেতে পারে। পরিচয় হলে তাদেরকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকীকতও প্রকাশ হয়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবী اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এবং

কোরআনের পক্ষ হতে এই দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করা وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে ঃ

প্রথমত, যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণত তারা ছিল ইহুদী। আল্লাহ্ তা'আলা এবং রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল। তাদেরকে রাসূল (সা)-এর রিসালত ও নবুয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কোরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোন-না-কোন প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছামাফিক আল্লাহ্ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন-না-কোন দিক দিয়ে আল্লাহ্কে মেনে নেয় এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে এক্কেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সেই ঈমানই গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ্র প্রতি তাঁর নিজের বর্ণিত সকল গুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের বর্ণিত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

জানা কথা যে, ইহুদীগণ কোরআনে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ্ বা আখেরাত, কোনটির প্রতিই ঈমান আনেনি। একদিকে তারা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র মনে করে, অপরদিকে আখেরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, নবী ও রাসূলগণের সন্তানগণ যা কিছুই করুক না কেন, যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, পরকালে তাঁদের কিছু হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি হলে তা হবে অতি নগণ্য। অতএব, তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যে ঈমানের কথা বলে থাকে, কোরআনের ভাষায় তাকে ঈমান বলা যায় না।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা ঃ কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা-বাক্কারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أٰمِنُوا كَمَا أٰمَنَ النَّاسُ যাতে

বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথ অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণ-যোগ্য নয়। যথা ঃ আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে-নবুয়তে বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহ্মদের নবুয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করেছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় এদেরকেও وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ -এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষ কথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীদের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের কোন নতুন পথ ও মত তৈরী করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মু'মিন বলে দাবী করে, মুসলমানদের নামায-রোযা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মু'মিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ হাদীস ও ফেকাহ্শাস্ত্রের একটা সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহ্লে-কেবলা তাদেরকেই বলা হবে, যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের স্বীকৃতি জানায়; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবীগণের ন্যায় দ্বীনের যাবতীয় জরুরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

এ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রোজ কিয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে

বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না—সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সাথে দুর্ব্যবহারেরই শামিল ঃ উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, يُخَادِعُونَ اللَّهَ অর্থাৎ, এরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত। বরং তারা রাসূল (সা) এবং মু'মিনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ্‌কেই ধোঁকা দেওয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র রাসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথেই খারাপ আচরণ করে। প্রসঙ্গত আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহ্‌র সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ—بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ—অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাকের অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। এতদসত্ত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে একথাই বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। তাই কোরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ-

অর্থাৎ—মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক।

সংশোধন ও ফাসাদের সংজ্ঞা এবং সংশোধনকারী ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীর পরিচয় ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—যখন এসব মুনাফিককে বলা হয় যে,

কপটতার মাধ্যমে জগতে ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করো না, তখন তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে বেড়ায় إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ এখানে إِنَّمَا শব্দটি প্রাসঙ্গিক শব্দের অর্থে সাবিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আমরাই তো আপোস-মীমাংসা বা কল্যাণ সাধনকারী। আমাদের কোন কাজের সম্পর্ক ফেতনা-ফাসাদের সাথে নেই। কিন্তু কোরআন এ দাবীর উত্তরে বলেছে ঃ

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

অর্থাৎ—স্মরণ রেখো, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না।

এতে দু'টি বিষয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রথমত, মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃত-পক্ষে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের কারণ। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের নিয়ত বা উদ্দেশ্যে এসব কাজ করত না, বরং তারা জানতও না যে, তাদের এ কাজ ফেতনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ দ্বারা এ অর্থই বোঝা যাচ্ছে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কতকগুলো কাজ আছে যেগুলো দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হয়, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়—এ সহজ বোধ সকলেরই রয়েছে। যথা—হত্যা, লুন্ঠন, চুরি-ডাকাতি, ধোকা ও শঠতা প্রভৃতি। এগুলো বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ফেতনা মনে করে এবং প্রত্যেক ভদ্র ও শান্তিকামী লোক প্রকারান্তরে এসব হতে দূরে থাকে। এমনও কিছু কাজ রয়েছে, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে ফেতনা-ফাসাদের কারণ মনে না হলেও সেগুলোর প্রতিক্রিয়া মানব-চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং চরিত্রকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। ফলে জগতে ফেতনা-ফাসাদের দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এ মুনাফিকদের অবস্থাও তাই। তারা চুরি ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি হতে বিরত থাকত আর সে জন্যই অত্যন্ত জোর গলায় বলে বেড়াতো যে, আমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী তো নই-ই, বরং আমরা শান্তি ও কল্যাণ-কামী। কিন্তু নিফাক বা হিংসা-বিদ্বেষপ্রসূত চক্রান্ত প্রভৃতির ফলে মানুষ চারিত্রিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে চলে যায় এবং এমন সব কাজে লিপ্ত হয়, যা কোন সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মানুষ যখন মানবচরিত্র হারিয়ে ফেলে, তখন জীবনের পদে পদে শুধু ফেতনা-ফাসাদই আসতে থাকে। আর সে ফেতনা এত মারাত্মক যে, তা হিংস্র জন্তু বা চোর-ডাকাতও করতে পারে না। অবশ্য তাদের এ কার্যে রাষ্ট্রীয় আইন বাধা দিতে পারে। কিন্তু আইন তো মানুষের রচিত। যখন মানুষই

মনুষ্যত্বের গণ্ডী থেকে দূরে সরে পড়ে, তখন আইনের নীতিমালা পদে পদে লঙ্ঘিত হয়। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারেই তা প্রত্যক্ষ করছেন। আধুনিক বিশ্বে তাহ্যীব-তমদ্দুন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে, শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টো আজ মানুষের মুখে মুখে, আইন প্রণয়নকারী সংস্থার দৃষ্টি আজ অত্যন্ত সচেতন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ব্যবস্থাপনা ও শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগও এ কাজে সদা ব্যস্ত আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অনাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আইন নিজে কোন যন্ত্র নয়; এর পরিচালনা মানুষের হাতেই ন্যস্ত। যখন মানুষ মানবীয় গুণাবলী হারিয়ে ফেলে, তখন এ ফেতনার প্রতিকার না আইনের দ্বারা হতে পারে, না সরকার করতে পারে, না প্রতিকারের অন্য কোন পন্থা দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য রাসূল (সা) তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় মানুষকে সত্যিকারের মানুষরূপে গঠন করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মানুষ যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে ফেতনা-ফাসাদ বন্ধ করার জন্য পৃথকভাবে আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা থাকে না। তখন আর পুলিশেরও এত বেশী প্রয়োজন হবে না, এত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানেরও দরকার হবে না। যখনই দুনিয়ার কোন অংশে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তখন দুনিয়ার সে অংশের মানুষ প্রকৃত শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান দেখেছেন। এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যায়নি, বিশেষত এ শিক্ষা বর্জনকারীদের মধ্যে তো নয়ই।

নবী করীম (সা)-এর উপদেশে আমল করার মূল কথাই হচ্ছে, আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালের হিসাব-নিকাশের চিন্তা। এ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখার বাস্তব শিক্ষা দান করতে পারে না।

সমকালীন পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তারা এসব অন্যায় ও অপরাধ রোধ করার জন্য নতুন নতুন পন্থা বের করেন বটে, কিন্তু মানুষের চরিত্র শুদ্ধির মূল উৎস, অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা যে শুধু গাফেল তাই নয়; বরং মানুষের হৃদয়-মন থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান চিরতরে উৎখাত করার ফিকিরে ব্যস্ত। এর পরিণাম হচ্ছে এই যে, দিন দিন অন্যায় ও অপরাধ শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ, কিন্তু যারা মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ফাসাদ কল্যাণের ছদ্মাবরণে প্রসার লাভ করছে।

তারা এজন্য মনোমুগ্ধকর এবং শঠতাপূর্ণ পরিকল্পনাও তৈরী করে। আর স্ব স্ব জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কল্যাণের আবরণে إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

-এর ধুয়া তোলে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে অন্যায় অপরাধ ও ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করার কথা বলেছেন, সেখানে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -

অর্থাৎ—"কে কল্যাণকারী আর কে ফাসাদকারী তাআল্লাহ্ই জানেন।" তাছাড়া প্রত্যেক কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণামও তিনি জানেন যে, এতে মীমাংসা হবে, না ফাসাদ হবে। এজন্য আপোস-মীমাংসার জন্য শুধু নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং কর্ম-পদ্ধতিও শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক হতে হবে। অনেক সময় কোন কোন কাজ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু তার পরিণাম দাঁড়ায় ফেতনা-ফাসাদ এবং মারাত্মক অকল্যাণ।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

(২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আলাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। এর দ্বারা হয়ত তোমরা দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (খোদায়ী ফরমানের ভাষায় 'হয়ত' শব্দ আশ্বাস বা অঙ্গীকারার্থে ব্যবহৃত হয়) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য জমিকে বিছানারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশকে ছাদরূপে তৈরী করেছেন; আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য খাদ্যরূপে ফলমূল সৃষ্টি করেছেন। অতএব, অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করো না। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না।

বস্তুত—তোমরা জান (যে, প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তাতে যমীন যে ফসল উৎপাদন করে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য কিভাবে মনে করা যেতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা ফাতিহার اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-এ যে দোয়া ও দরখাস্ত করা হয়েছে, তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে সূরা আল-বাক্কারার দ্বিতীয় আয়াতে। এর অর্থ, যে সরল পথ তোমরা চাও, তা-ই এ কোরআনে রয়েছে। কোরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাতে-মুস্তাকীমেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কোরআনের হেদায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানকারী মানব-সমাজকে তিনটি দলে বিভক্ত করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে সেসব মু'মিন-মুত্তাকীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, যারা কোরআনের হেদায়েতকে জীবন-সাধনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আলোচিত হয়েছে সে দলের কথা, যারা এ হেদায়েতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার এবং বিরুদ্ধাচরণ করেছে। পরবর্তী তেরটি আয়াতে সে মারাত্মক দলের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত এ হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যারা দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বীয় কুফর ও ইসলাম-বিরোধী ভাবধারাকে গোপন রেখে এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দলে মিশেছে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে।

এমনিভাবে সূরা বাক্কারার প্রথম বিশটি আয়াতেও এ হেদায়েতকে গ্রহণ করা ও

বর্জন করার ব্যাপারে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে এ কথার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে যে, বিশ্ব-মানবকে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের নিরিখে বিভক্ত করা চলে না। বরং এর সঠিক বিভক্তি একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই করা যেতে পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর হেদায়েত গ্রহণকারীদেরকে এক জাতি, পক্ষান্তরে অমান্যকারীদেরকে অন্য জাতি হিসাবে ভাগ করা হয়। এ দু'টি ভাগকেই সূরা-হাশরে হিযবুল্লাহ্ ও হিযবুশ্ শয়তান—এ দু'টি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মোট কথা, সূরা আল-বাক্বারার প্রথম বিশটি আয়াতে আল্লাহ্র হেদায়েতকে মানা-না-মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর একুশ ও বাইশতম আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা থেকে বিরত থেকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যাতে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

প্রথম আয়াত ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা আহবানের সূচনা হয়েছে। نَاسٌ (নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ ইবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাঁবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। (রূহুল বয়ান, খ. ১ পৃ. ৭৪,) 'রব' শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়—স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ্' বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর মানুষকে এ অগণিত নেয়ামত না পাথর নির্মিত কোন মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে। তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃত প্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

এ বাক্যে মানুষের তিনটি দলই অন্তর্ভুক্ত। তবে উল্লেখিত তিন দলের প্রত্যেকের বেলায় এ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। কাজেই যখন কাফিরদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর, তখন এর অর্থ হয়, সকল সৃষ্টবস্তুর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে তওহীদ বা একত্ববাদ গ্রহণ কর। মুনাফিকদের বেলায় এ বাক্যের অর্থ হবে—কপটতা ত্যাগ করে আন্তরিকতা ও সরলতা গ্রহণ কর। মুসলমান পাপীদের বেলায় অর্থ হবে—পাপ পরিহার করে পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন কর। আর মু'মিন-মুত্তাকীদের বেলায় এর অর্থ হবে—ইবাদত ও আনুগত্যে দৃঢ় থাক এবং এতে উন্নতির চেষ্টা কর।"—(রূহুল-বয়ান)

অতঃপর 'রব' বা পালনকর্তার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করে এ বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের সে পালনকর্তা—যিনি তোমাদেরকে এবং তোমার পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এতে 'রব'-এর অস্তিত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তাতে থাকার কোন ধারণাও কেউ করতে পারে না। তা হচ্ছে, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাছাড়া মাতৃগর্ভের অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ পরিবেশে এত সুন্দর ও এত পবিত্র মানুষ তৈরী করা, যার পবিত্রতা দেখে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষা হয়। তা সে একক সত্তা ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা হতে পারে না; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

এ স্থলে خَلَقَكُمْ -এর সাথে الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ যুক্ত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের বাপ-দাদা, অর্থাৎ, গোটা মানবজাতির স্রষ্টা সেই 'রব'। অতঃপর مِنْ قَبْلِكُمْ বলেছেন, কিন্তু مِنْ بَعْدِكُمْ না বলে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, উম্মতে-মুহাম্মদীর পর আর কোন উম্মত বা মিল্লাত হবে না। কেননা, খতমে-নবুওয়াতের পর আর কোন নবী-রসূলের আগমন হবে না এবং কোন নতুন উম্মতও হবে না। অতঃপর এ আয়াতের শেষ বাক্য لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ—দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে শাস্তি থেকে মুক্তির পথ তোমাদের জন্য একমাত্র এই যে, তওহীদকে গ্রহণ কর এবং শিরক থেকে বিরত থাক। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে 'রব'-এর দ্বিতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۝

অর্থাৎ—"সে সত্তাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদরূপে সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা ফলমূল আহার্যরূপে সৃষ্টি করেছেন।" পূর্বের আয়াতে ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যেগুলো মানুষের সত্তার সাথে মিশে রয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে সে সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের চারদিকের বস্তুসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ—প্রথম আয়াতে মানবসৃষ্টি এবং দ্বিতীয় আয়াতে প্রকৃতির ভাণ্ডারে ছড়িয়ে থাকা নেয়ামতসমূহের বর্ণনা করে সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় নেয়ামতকেই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নেয়ামতের মধ্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনকে পানির মত এমন নরম করা হয়নি, যাতে স্থির হয়ে এর উপর দাঁড়ানো যাবে না; আবার লৌহ বা পাথরের মত এত শক্তও করা হয়নি যে, প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং নরম ও শক্ত—এ দুয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে।

فِرَاشٌ শব্দের দ্বারা একথা বোঝায় না যে, পৃথিবীর আকৃতি গোল নয়। বরং ভূখণ্ড গোল হওয়া সত্ত্বেও দেখতে বিছানার মত বিস্তৃত দেখায়।

কোরআন বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনাদান উপলক্ষে এমন এক বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করেছে যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও সরল-বিচক্ষণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই তা অতি সহজে বুঝতে পারে। দ্বিতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশকে অতি মনোরম শোভায় শোভিত করে একটি ছাদের ন্যায় উপরে বিস্তৃত করে রাখা। তৃতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ। 'আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন' বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝবার কারণ নেই যে, মেঘমালার মাধ্যম ব্যতীতই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হচ্ছে। বরং সাধারণ পরিভাষায় উপর থেকে আগত যাবতীয় বস্তুকেই যেহেতু 'আকাশ থেকে অবতীর্ণ' বলে উল্লেখ করা হয়, সে জন্যই এরূপ বলা হয়েছে।

অধিকন্তু কোরআনের বহু স্থানে মেঘ থেকে পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ○

অর্থাৎ—শ্বেত-শুভ্র মেঘমালা থেকে বৃষ্টির পানি কি তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۔

অর্থাৎ—আমি পরিপূর্ণ মেঘ থেকে প্রবাহিত পানি বর্ষণ করছি।

চতুর্থ নেয়ামত হচ্ছে, পানি বর্ষণ করে ফলমূল উৎপন্ন করা এবং সেগুলোকে মানুষের আহার্যে পরিণত করা।

আল্লাহ্‌র উপরোক্ত চারটি গুণের মধ্যে প্রথম তিনটি এমন, যেগুলোতে মানুষের চেষ্টা ও কর্ম তো দূরের কথা, তার উপস্থিতিরও দখল নেই। যে সময় যমীন ও আসমান সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাজ করছিলেন, সে যুগে তো মানুষের অস্তিত্বও ছিল না। এ সম্পর্কে কোন নির্বোধও এমন কল্পনা বা সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশাল জগত আল্লাহ্ তা আলা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ, মূর্তি বা দেবতা অথবা অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে।

তবে যমীন থেকে ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে আপাতঃদৃষ্টিতে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাটিকে নরম করে বা তাতে হালচাষ করে, বীজ বুনে ফসল উৎপাদনের জন্য তৈরী করা হয়তো মানুষের শ্রমেই সম্ভব হয়ে থাকে।

কিন্তু কোরআনের অন্য এক আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃক্ষ সৃষ্টি ও তাতে ফলমূল উৎপাদনে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের আদৌ কোন ভূমিকা নেই। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ যে পরিশ্রম স্বীকার করে, তা প্রকৃতপক্ষে অঙ্কুর উদগমের পর্যায় থেকে শুরু করে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত যেসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, শুধু সেগুলো অপসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তা করুন—জমি চাষ করা, গর্ত খনন করা, আগাছা দূর করা, সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমিকে নরম করা প্রভৃতি কৃষকের প্রাথমিক কাজগুলো তো শুধু বীজ ও অঙ্কুর উদগমের পথে যাতে করে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বীজ থেকে অংকুর বের করে আনা এবং এগুলোকে ফলমূল ও পত্র-পল্লবে সজ্জিত করায় কৃষকের পরিশ্রমের কোন দখল বা ভূমিকা আছে কি?

অনুরূপভাবে কৃষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে জমিতে বীজ বপন, এর রক্ষণাবেক্ষণ, চারা-গাছকে শীত-তাপ ও জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তার অর্থ, আল্লাহ্‌র কুদরতে সৃষ্ট গাছকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং চারা বেড়ে ওঠার পথে বাধা দূরীকরণ পর্যন্তই কৃষকের কাজ। বলা যেতে পারে যে, পানি সেচের মাধ্যমে বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করা কৃষকের কাজ বটে, কিন্তু পানি তো তাদের সৃষ্ট নয়। কৃষকের অবদান শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পানিকে আল্লাহ্‌রই আর এক সৃষ্টি ফসলের গোড়ায় একটি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করবে।

এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে—ফসলের গাছ সৃষ্টি, এর প্রবৃদ্ধি ও ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মানুষের যে চেষ্টা-তদবীর নিয়োজিত হয়, সেসব একান্তভাবেই উৎপাদনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো দূর করা বা একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কিছু বৃক্ষ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি, তাকে ফলে-ফুলে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কুদরত ছাড়া অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব নেই। আল-কোরআন এ সম্পর্কে এরশাদ করেছে ঃ

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ۝

অর্থাৎ "বল তো, তোমরা যা বপন কর, সেগুলো কি তোমরা উৎপাদন কর, না আমি উৎপাদন করি?"

কোরআনের এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক বাক্যে একথাই বলতে বাধ্য হয় যে, এ সবের উৎপাদনকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, অন্য কেউ নয়।

এ আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং বৃষ্টি বিদ্যুৎ বর্ষণ করার যে নিয়মিত বিধান আছে তাতে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের কোন দখল নেই। অনুরূপভাবে বীজ থেকে ফসল ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, একে ফলে-ফুলে, পত্র-পল্লবে সজ্জিত-রক্ষিত করায় এবং তদ্দ্বারা মানুষের আহার্য প্রস্তুত করায় মানুষের শ্রম নামেমাত্রই ব্যবহার হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে এসব কাজ আল্লাহ্‌রই কুদরত ও হেকমতের ফলশ্রুতি।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার এমন চারটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ দু'টি আয়াত দ্বারাও বোঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং বেঁচে থাকার জন্য আসমান, যমীন, ফল-ফসল ইত্যাদি দ্বারা রিযিক তৈরী করা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। এজন্য সামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করে, তবে তার চাইতে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে?

نعمتت راخوردہ عصیاں میکنم - نعمت ازتو من بغیرے- می تنم -

অর্থাৎ,—"তোমার নেয়ামত খেয়েই পাপ করি। তোমার নেয়ামত আমি ছাড়া আর কে খায়?" আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা বা সরদার বানিয়েছেন এবং এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন যাবতীয় সৃষ্টি তাদের খেদমত করবে, আর তারা শুধু বিশ্বপালকের এবাদত ও খেদমত করবে। কিন্তু আত্মভোলা মানুষ স্বয়ং আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে; ফলে তাদের শত শত দেবতার গোলামিতে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে।

ایک درچھوڑ کے ہم ہوگئے لاکھوں کے غلام -
ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام -

অর্থাৎ—এক দরজা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ বস্তুর গোলামে পরিণত হয়েছি। যন্ত্র-তন্ত্র বিচরণের এই যে স্বাধীনতা, এর পরিণাম চিন্তা করিনি।

মানুষকে অন্যের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের শেষাংশে এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ—কাউকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, আর তোমরা তো জানই। অর্থাৎ, যখন তোমরা জান যে, তোমাদের জন্ম, তোমাদের লালন-

পালন ও বর্ধন, জ্ঞান-বুদ্ধি দান এবং বসবাসের জন্য জমি, অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন, তা দিয়ে আহার্য তৈরী প্রভৃতি যখনই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাজও নয়, অন্য কেউ তা করতেও পারে না, তখন এবাদত-বন্দেগীর যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদার করা নিতান্ত অন্যায়।

সারকথা, এ দু'টি আয়াতে তওহীদের সে দাওয়াতই দেওয়া হয়েছে, যে দাওয়াত প্রচারের জন্য সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর সমস্ত নবী ও রসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে। পরন্তু এক আল্লাহ্র এবাদত-বন্দেগী করার নামই তওহীদ।

এটা সেই যুগান্তকারী পরিকল্পনা, যা মানুষের যাবতীয় কাজে, যথা 'আমল-আখলাক, আচার-ব্যবহার সবকিছুর উপরই অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কেননা, যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করে যে, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক, সকল পরিচালনা এবং সকল বস্তুর উপর একক ক্ষমতার অধিকারী একটি মাত্র সত্তা, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারো নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই, কেউ কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না, তখন বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে, অভাব-অনটনে সর্বাবস্থায় সে মহাসত্তার প্রতি তার সকল মনোযোগ ও আকর্ষণ নিয়োজিত হবে, ফলে তার সে যোগ্যতা অর্জিত হবে যাতে সে বাহ্যিক বস্তুর হাকীকত চিনতে পারবে এবং অনুভব করতে পারবে যে, এ সবকিছুর পেছনেই এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে।

বিজলী বা বাষ্পের উপাসক পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারত, তবে তারা বুঝত যে, এ বিজলী ও বাষ্পের ঊর্ধ্বে আরও কোন শক্তি রয়েছে এবং প্রকৃত শক্তি বিজলীতেও নেই, বাষ্পেও নেই; বরং যিনি এ বিদ্যুৎ ও বাষ্প সৃষ্টি করেছেন, সে মহাসত্তাই সমস্ত শক্তির উৎস। অবশ্য একথা বোঝার জন্য গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন। আর যারা এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এ দুনিয়াতে যত বড় দার্শনিক ও জ্ঞানীই হোক না কেন, সেই সরল লোকটিরই মত যে রেল স্টেশনে এসে গার্ডের হাতে লাল ও সবুজ নিশান দেখতে পেলো। সবুজ নিশান দেখালে গাড়ী চলতে থাকে, আর লাল নিশান দেখালে থামে। তা দেখে সে চিন্তা করে বুঝে নিল যে. এ নিশানগুলিই এতবড় দ্রুতগামী গাড়ী চালানো ও থামানোর মালিক এবং প্রকৃত শক্তির উৎস। এই লোকটির বুদ্ধি দেখে মানুষ তাকে উপহাস করে। কারণ সে এটা বুঝে না যে, নিশান হল একটি নিদর্শন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ হচ্ছে চালকের, যে লোকটি ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে। আসলে এ কাজটি চালকেরও নয়; বরং এটি ইঞ্জিনের সকল কল-কব্জার সম্মিলিত কাজ। আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়—এ কাজটি

চালকেরও নয়; ইঞ্জিনেরও নয়; বরং ইঞ্জিনের ভেতরে যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, সেই উত্তাপের। এমনিভাবে একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী লোক বস্তুবাদী তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রতি এই বলে উপহাস করে যে, প্রকৃত হাকীকত তোমরাও বুঝ না; চিন্তার স্থান আরও দূরে। দৃষ্টিশক্তি আরও প্রখর কর, আরও গভীরভাবে লক্ষ্য কর, তখন বুঝতে পারবে, বাষ্প বা এ আগুন এবং এ পানিও কিছুই নয়। এ শক্তি সে সত্তার, যিনি আগুন-পানি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশে এগুলো নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

خاک وباد وآب وآتش بندہ اند۔
بامن وتو مردہ باحق زندہ اند۔

অর্থাৎ মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন যা মানুষের মাঝে রয়েছে, তা আমার-তোমার কাছে মৃত, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সজীব।

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয়ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ বাক্যটিতে لَعَلَّ শব্দ 'আশা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে উম্মিদ বা আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিনঃ ইসলামের মৌলিক আকীদা তাওহীদে বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদ মাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং তার সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা, তওহীদে বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ মাত্র।

ہر تغیر ہے غیب کی آواز۔ ہر تجدد میں ہیں ہزاروں راز۔

অর্থাৎ—প্রতিটি পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে অদৃশ্যের সাড়া এবং প্রতিটি নতুনে রয়েছে অসংখ্য রহস্য।

স্বাভাবিকভাবেই এরূপ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় যদি কারো অন্তরে সত্যিকার অর্থেই

বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের উপর যথার্থ দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে পারে, তবে তার জন্য এ বিশ্বজগতই বেহেশতে রূপান্তরিত হয়। যেসব কারণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানির সৃষ্টি হয়, সেসবের মূলই উৎপাটিত হয়ে যাবে, তার সামনে তখন এ শিক্ষাই শুধু প্রকাশমান থাকবে যে ঃ

از خدادان خلاف دشمن ودوست - کہ دل ہر دو در تصرف اوست -

অর্থাৎ—শত্রু-মিত্রের বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে, কেননা উভয়ের অন্তরের পরিবর্তন তাঁরই হাতে সাধিত হয়। এ আকীদায় বিশ্বাসীরা সারাবিশ্ব হতে বেপরোয়া ও সকল ভয়-ভীতির উর্ধ্বে জীবন যাপন করে। তার অবস্থা হয় নিম্নোক্ত কবিতাটির মত—

موحد چہ برپائے ریزی زرش - چہ فولاد ہندی نہی برسرش
امید وہراسش نباشد زکس - ہمین است بنیاد توحید وبس

কলেমা لا اله الا الله যাকে কালেমা-এ-তাওহীদ বলা হয়, উদ্ধৃত কবিতাটির অর্থ এবং মর্মও তাই। কিন্তু তাওহীদের এ মন্ত্রে মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং সঠিক অন্তরে এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং সার্বক্ষণিকভাবে এ বিশ্বাসের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখাও আবশ্যক। কেননা, এক আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দৃষ্টির সম্মুখে জাগ্রত থাকাকেই তাওহীদ বলে ; মৌখিক স্বীকৃতিকে নয়। لا اله الا الله পাঠ করার মত কোটি কোটি লোক এ যমানায় রয়েছে। এদের সংখ্যা এত বেশী যে, ইতিপূর্বে কখনও এত ছিল না। কিন্তু সাধারণ বিচারেই এ বিপুল জনসংখ্যাকে মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর তাওহীদের বিপ্লবী রঙে রঞ্জিত বড় একটা দেখা যায় না নতুবা অবস্থাও পূর্বেকার বুযুর্গদের মতই হতো। বৃহৎ হতে বৃহত্তর কোন শক্তিও তাদেরকে অবনত করতে পারত না। কোন জাতির অগণিত লোকসংখ্যা তাদের উপর কোন প্রভাবও বিস্তার করতে পারত না। যে কোন জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা পার্থিব সম্পদ তাদের অন্তরকে আল্লাহ্-বিরোধী কোন কাজে আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হতো না। আল্লাহ্‌র নবী একা দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমার নীতিতে কোন পরিবর্তন আনার সাধ্য কারো নেই। আমার কোন ক্ষতি করার সামর্থ্যও হবে না কারো।

নবী করীম (সা)-এর পর সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অল্প দিনের মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছেন। তাঁদের শক্তি প্রকৃত তাওহীদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমি-আপনি এবং সারা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ্ যেন এ সম্পদ দান করেন।

কোরআনের অকাট্যতায় রিসালতের প্রমাণ ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ
تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

(২৩) এতদ্সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। (২৪) তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও—এক আল্লাহ্কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার—অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না—তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

আমি আমার (এ বিশেষ) বান্দার প্রতি (যে গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো। (কেননা তোমরাও আরবী ভাষা জান, আর এ ভাষার গদ্য-পদ্য সকল রীতিও তোমাদের জানা, তোমরা গদ্য ও কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। অথচ মুহাম্মদ (সা) এ বিষয়ে অভ্যস্ত নন। এতদসত্ত্বেও তোমরা যখন কোরআনের কোন একটি সূরার সমপর্যায়ের কোন সূরা রচনা করতে পারলে না, তখন ন্যায়নীতির ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, কোরআনরূপী এ মু'জিযা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ এবং ইনি আল্লাহ্রই

পয়গাম্বর)। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও এক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে রেখেছ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি তোমরা না পার, আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, তবে দোযখের আগুন, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, তা হতে বাঁচতে চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে (কৃতঘ্ন) কাফেরদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ ঃ এ দু'টি সূরা আল-বাক্বারার তেইশ ও চব্বিশতম আয়াত। এর পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে রিসালতে-মুহাম্মদীর প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। আল-কোরআন যে হেদায়েত নিয়ে আগমন করেছে, তার দু'টি স্তম্ভের একটি তাওহীদ ও অন্যটি রিসালত। প্রথম দু'আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার কয়েকটি বিশেষ কাজের উল্লেখ করে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্‌র কালাম পেশ করে হুযূর (সা)-এর রিসালত প্রমাণ করা হচ্ছে। উভয় বিষয়ের প্রমাণপদ্ধতি একই। প্রথম দু'টি আয়াতে এমন কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ আদৌ করতে পারে না। যথা, যমীন ও আসমান সৃষ্টি করা, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করা, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি। এ দলীলের সারকথা এই যে, যখন এসব কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এবাদতও তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না।

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারকতার আলোকেই এ সত্য সপ্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদিগকে আরও সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও।

এজন্য তোমরা বিশ্ব-সম্মেলন ডাক, চেষ্টা কর। কিন্তু না, তা পারবে না। অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, যখন কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবে না, তখন দোযখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব-রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরাছোঁয়া ও নাগালের উর্ধ্বে। যাঁর শক্তি সকলের উর্ধ্বে এমন এক মহা-সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোযখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দু'টি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বা-পেক্ষা বড় মু'জিযা হিসাবে অভিহিত করে তাঁর রিসালত ও সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রসূল (সা)-এর মু'জিযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রতিটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইশারা করা হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হচ্ছে কোরআন এবং এ মু'জিযা অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মু'জিযা হতে স্বতন্ত্র। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার কুদরতে রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জিযা যে সমস্ত রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জীবৎকাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ

رَيْبٌ শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর মতে رَيْبٌ এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও ريب-এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে; যথা, এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -

একই কারণে কোরআনের প্রথম সূরা আল-বাক্কারায় কোরআন সম্পর্কে বলা

হয়েছে, لَا رَيْبَ فِيْهِ "এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।" আলোচ্য এ আয়াতে وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ অর্থাৎ 'যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়' বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক প্রমাণাদি সমৃদ্ধ কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই থাকতে পারে না, তবু শোন! فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ সূরা শব্দের অর্থ সীমিত টুকরা। আর কোরআনের সূরা কোরআনের সেই অংশকে বলা হয়, যা ওহীর নির্দেশ দ্বারাই অন্য অংশ হতে পৃথক করা হয়েছে।

সমগ্র কোরআনে ছোট-বড় মোট একশত চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। আর এ স্থলে سورة শব্দটিকে 'আলিফ-লাম' বর্জিতভাবে ব্যবহার করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে অথবা যদি এরূপ মনে কর যে, এটি নবী করীম (সা) নিজে কিংবা অন্য কোন মানুষ রচনা করেছেন, তবে এর মীমাংসা অতি সহজে এভাবে হতে পারে যে, তোমরাও কোরআনের ক্ষুদ্রতম যে কোন সূরার মত একটি সূরা রচনা কর। তাতে যদি কৃতকার্য হতে পার, তবে তোমাদের দাবী সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং তোমরা একথা বলতে পারবে যে, কোরআন মানবরচিত একটি পুস্তক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে যদি তা না পার, তবে মনে করতে হবে যে, এটি সত্যই মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে, আল্লাহ্‌র রচিত কালাম।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা পারিনি বলে অন্য কোন লোক বা দল তা করতে পারবে না, একথা তো বলা চলে না। এজন্য এরশাদ হয়েছে ঃ

وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

شاهد - شهداء শব্দের বহুবচন, অর্থ—উপস্থিত। সকল সাক্ষীকে শাহেদ এজন্যই বলা হয় যে, তাদেরকেও আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হয়। এখানে ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের যার যার কাছ থেকে তোমরা এ কাজে সাহায্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে কর, তাদেরও সাহায্য গ্রহণ কর। অথবা এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দেবতা, যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে এ সব দেবতা তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তা

করতে না পার, তবে জাহান্নামের সে আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সে আগুন তোমাদের মত অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি وَلَنْ تَفْعَلُوا বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যতই প্রচেষ্টা চালাও না কেন তোমরা অনুরূপ আয়াত রচনা করতে পারবে না। কারণ, তা তোমাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে জাতি ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধাচরণে এবং এর মূল উৎপাটন করার জন্যে জানমাল, ইজ্জত প্রভৃতি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে এত সহজ একটা পথ দেখানো হলো এবং এমন সুলভ সুযোগ দেওয়া হলো যে, তোমরা কোরআনের যে কোন ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা কর; তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা আদৌ তা করতে পারবে না। এমন একটা চ্যালেঞ্জের পরও সে জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও কেন এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এলো না? তাদের সে অপারকতাই কি কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম তার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়? এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এমন এক জ্বলন্ত মু'জিযা যে, এর সামনে সকল বিরোধী শক্তি মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয়েছে।

কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিযা ঃ অন্য সমস্ত নবী ও রাসূলের মু'জিযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু'জিযা হুযুর (সা)-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মত মু'জিযাসুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না,—আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরী করে দেখাও। তফসীরে-জালালাইন প্রণেতা শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় 'খাসায়েসে কুবরা' গ্রন্থে রসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'টি মু'জিযা হাদীসের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি কোরআন এবং অপরটি হচ্ছে এই যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযুর! হজ্জের সময় তিনটি প্রতীক্‌কে লক্ষ লক্ষ হাজী তিন দিন পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। এ সব পাথর টুকরা তো কেউ অন্যত্র উঠিয়েও নিয়ে যায় না, এতে তো এ স্থানে প্রতি বছর পাথরের এমন স্তূপ হওয়ার কথা, যাতে প্রতীকগুলো নিমজ্জিত হয়ে

যায়। একবার নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করাও নিষেধ। তাই হাজীগণ মুযদালিফা থেকে যে পাথর নিয়ে আসেন, এতে তো দু-এক বছরে পাহাড় হওয়ার কথা, কিন্তু তা তো হয় না? হুযুর (সা) জবাব দিলেনঃ এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যেন যে সব হাজির হজ্জ কবুল হয়, তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর টুকরাগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায়, আর যে সমস্ত হতভাগার হজ্জ কবুল হয় না, তাদের কংকরগুলো এখানেই থেকে যায়। এ জন্যই এখানে কংকরের সংখ্যা কমই দেখা যায়। তা না হলে এখানে পাথরের পাহাড় হয়ে যেতো (সুনানে বায়হাকীতে এ বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে)।

এটি এমন একটি হাদীস যদ্দ্বারা প্রতিবছর রসূল (সা)-এর সত্যতা প্রতীয়মান হয় এবং এমন একটি বাস্তব সত্য যে, প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে হাজার হাজার হাজী একত্রিত হয় এবং প্রত্যেক হাজী প্রতিদিন তিনটি ফলক লক্ষ্য করে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করে। কোন কোন অতি উৎসাহী লোক বড় বড় পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করে থাকে এবং একথাও সত্য যে, এসব পাথরকণা পরিষ্কার করার জন্য না সরকার কোন ব্যবস্থা করে, না কোন বেসরকারী দল নিযুক্ত থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে যে, সেখান থেকে কেউ কংকর পরিষ্কার করে না। তাই পরের বছর দ্বিগুণ, তৃতীয় বছর ত্রিগুণ জমা হবে। এতে এ এলাকা প্রতীক-চিহ্নটিসহ পাথরঢাকা পড়বে, এমনকি দিনে দিনে এখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় সৃষ্টি হয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে তো তা হয় না! এ আশ্চর্যজনক বাস্তব বিষয়টি যুগে যুগে রাসূল (সা)-কে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট।

অনুরূপভাবে কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। হুযুরের যুগে যেমন এর নযীর পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি; ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অনন্য কোরআনঃ উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা বলা হয়? আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নযীর পেশ করতে অপারক হলো?

দ্বিতীয়ত মুসলমানদের এ দাবী যে, চৌদ্দশ বছরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কোরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ

কোন রচনাও পেশ করতে পারেনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবীর যথার্থতা কতটুকু—এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ।

কোরআনের মু'জিযা হওয়ার অন্যান্য কারণ ঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে মু'জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নযীর পেশ করতে অপারক হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাস্‌সিরই স্ব স্ব বর্ণনাভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করছি।

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার, মহান গ্রন্থটি কোন্ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথ-নির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা উষর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে, যা ছিল 'বাত্‌হা' বা মক্কা নামে পরিচিত। এই এলাকার ভূমি কৃষিকাজের উপযোগী ছিল না। এখানে কোন কারিগরি শিল্প ছিল না। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করত। ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে

কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল-কলেজ, না ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার বৃষ্টিধারার মত আবৃত হতো পথে-প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক আশ্চর্য বিস্ময়, আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোন সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করত, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমদানী-রপ্তানীই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহ্র পবিত্রতম কিতাব কোরআন নাযিল করা হয়। প্রসঙ্গত সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজ দিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি, যার দ্বারা এ অসহায় এতীমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারত। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত-পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতও তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে 'উম্মী' জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালাবধি যে কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যাঁর সাহচর্যে থেকে এমন কোন জ্ঞানসূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্যসাধারণ মু'জিযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য,

তাই মামুলী অক্ষরজ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন-না-কোন উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে ওঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতেও তিনি শেখেন নি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্যচর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসত। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব-কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করত। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন রুচিদান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এ ধরনের কবি জলসায় শরীক হন নি। জীবনে কখনও একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেন নি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত; সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে 'আল-আমীন' বলে অভিহিত করা হতো।

এই নিরক্ষর ব্যক্তিটি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণেও যান নি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দু'টি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মক্তবেও যান নি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেন নি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সেই বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করত। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মানই মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহ্বান করেছে যে, যদি একে আল্লাহ্র কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও।

একদিকে কোরআনের আহ্বান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জানমাল, শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিনরাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও

অনন্যসাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ব-বাসীর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষাশৈলীর উপর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। এদিক দিয়ে আরবরা সারা বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, "কোরজান যে আল্লাহ্‌র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল-কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারত, কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবিলা কোনমতেই অসম্ভই হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরী করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। এমন সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল ; কয়েকটি বাক্যও তৈরী করতে পারল না!

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রাসূল (সা)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর স্বল্প-সংখ্যক অনুসারীকে নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরল। আরবের বড় সরদার ওত্‌বা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে হুযুর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, "আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে।" তিনি এর

উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু কেউই কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হল না; তারা কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরী করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে; কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহ্‌রই রচিত কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুন্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ-বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আব্‌দে মনাফের প্রতি বিদ্বেষবশত কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বোঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং কোরআন নাযিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ মক্কায় আগমন করবে। তারা রসূল (সা)-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়েশরা একটা বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করল। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সবাই তাঁর নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করল। তারা বলল, এখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আমাদেরকে

জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি। ওলীদ বললেন, তোমরাই বল, কি বলা যায়। তারা উত্তর দিল যে, আমরা তাঁকে পাগল বলে পরিচয় দিয়ে বলব, তাঁর কথাবার্তা পাগলামিতে পরিপূর্ণ। ওলীদ তাদেরকে এরূপ বলতে বারণ করে বলে দিলেন, ওরা মানুষ মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়ে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে।

অপর একদল প্রস্তাব করলো, আমরা তাঁকে কবি বলে পরিচয় দেব। তিনি তাও বলতে নিষেধ করলেন। কেননা, আরবের প্রায় সবাই ছিল কবিতায় পারদর্শী। তাই তারা মুহাম্মদের কথা শুনে ভালভাবেই বুঝতে পারবে যে, বিষয়টি সত্য নয়, তিনি কবি নন। ফলে তারা সবাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেউ কেউ মন্তব্য করলো, তবে আমরা তাকে যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে বলবো যে, সে শয়তান ও জ্বিনদের কাছ থেকে শুনে গায়েবের সংবাদ বলে বেড়ায়।

ওলীদ বললেন, একথাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করানো যাবে না; বরং শেষ পর্যন্ত লোকেরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, তারা যখন তাঁর কথা-বার্তা ও কালাম শুনবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এসব কথা কোন যাদুকরের নয়। শেষ পর্যন্ত কোরআন সম্পর্কে ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজের মতামত বর্ণনা করে-ছিলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! কবিতার ক্ষেত্রে আমার চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা তোমাদের কারো নেই। সত্য বলতে কি, এ কালামে অবর্ণনীয় একটা আকর্ষণ রয়েছে। এতে এমন এক সৌন্দর্য বিদ্যমান, যা আমি কোন কাব্য বা অসাধারণ কোন পণ্ডিতের বাক্যেও কখনও পাইনি।

তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, তবে আপনি বলুন, আমরা কি বলবো? ওলীদ বললেন, আমি চিন্তা করে বলব। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে যাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক যাদুবলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মত এ কথায় একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুঁৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমিয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো। (খাসায়েসে-কুবরা)

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (সা) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্র মাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে! কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যাদুকর নন। আমি বহু যাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরও জেনে রেখ! আমি অনেক যাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা যাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবূ যর (রা) বলেছেন, আমার ভাই উনাইস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে দাবী করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউবা যাদুকর বলে। আমার ভাই উনাইস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, যাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

আবূ যর (রা) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ছাড়া আমি অন্য কিছুই খাইনি। কিন্তু

এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি! দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি! শেষ পর্যন্ত কাবা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের বললাম—আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক যাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবূ যরের এ প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কওমের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় বড় শত্রু আবূ জাহ্‌ল এবং আখনাস ইবনে শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলত যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবূ জাহ্‌ল বলতো, তোমরা জান যে, বনি আবদে-মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বাধা দিই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর কাছে আল্লাহ্‌র বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবো, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা, কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারক হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআনে ও কোরআনের বাহক পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে জানমাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু'টি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি।

এর কারণ এই যে, সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল, মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুঁয়েমির মাধ্যমে কোন বাক্য

রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। কেননা, তারা জানতো যে, আমরা যদিও কোন বাক্য পেশ করি, সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতি চুপ করেছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুন্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরারা হযরতের চাচা আব্বাস (রা)-এর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহ্‌র কালাম, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

বনী সোলায়েম গোত্রের কায়স বিন নাসীবা নামক এক লোক রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কোরআন শুনে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হুযুর (সা) তার জবাব দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে বলেন যে, আমি রোম ও পারস্যের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতের কালাম শুনেছি, অনেক যাদুকরের কথাবার্তাও শুনেছি, তাতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর কালামের অনুরূপ কালাম আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। তোমরা আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। এসব স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি এমন লোকদের নয়, যারা হুযুর (সা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং যারা সর্বদা সবদিক দিয়ে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণে ব্যস্ত ছিল তাদেরই এ স্বীকারোক্তি। কিন্তু তারা নিজেদের একগুঁয়েমির দরুন মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতো না।

আল্লামা সুয়ূতী (র) বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে 'খাসায়েসে-কুবরা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার আবু জাহ্‌ল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে শোরাইক রাতের অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর যবানী কোরআন শোনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, একে একে সবাই সে বাড়ির আশেপাশে সমবেত হয়ে আত্মগোপন করে তেলাওয়াত শুনতে থাকে। এতে তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে যায়। ভোরে বাড়ি ফেরার পথে দৈবাৎ রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং সবাই সবার ব্যাপারে অবগত হয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে যে, তুমি খুবই অন্যায়

করেছ। ভবিষ্যতে আর যেন কেউ এমন কাজ করো না। কেননা, আরবের সাধারণ লোক এ ব্যাপার জানতে পারলে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। পরস্পর এমন কথা বলাবলি করে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল। পরের রাতে পুনরায় তাদের কোরআন শোনার আগ্রহ জাগে এবং গোপনে প্রত্যেকেই এসে একই স্থানে সমবেত হয়। রাতশেষে প্রত্যাবর্তনকালে সাক্ষাৎ হলে আবার একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। তারপর থেকে তা বন্ধ করতে সবাই একমত প্রকাশ করে। কিন্তু তৃতীয় রাতেও তারা কোরআন শোনার আগ্রহে পূর্বের মতই চলে যায়। রাতশেষে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। এবার তাঁরা সবাই বলে যে, চল এবার আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আর কখনো একাজ করবো না। এভাবেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। পরদিন সকালে আখনাস ইবনে শোরাইক লাঠি হাতে নিয়ে প্রথমে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে যে, বল, মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে শেষ পর্যন্ত কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর আখনাস আবূ জাহ্লের বাড়ি গিয়ে তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করে। আবু জাহল উত্তর দিল, পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ব থেকেই আবদে-মনাফ গোত্রের সাথে আমাদের গোত্রের শত্রুতা চলে আসছে। তারা কোন ব্যাপারে অগ্রসর হলে আমরা তাতে বাধা দিই। তারা বদান্যতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের চাইতে অধিক দান-খয়রাত করে এর মোকাবিলা করেছি। তারা সমগ্র জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা তাদের পেছনে থাকিনি। সমগ্র আরববাসী জানে, আমাদের এ দু'টি গোত্র সমমর্যাদাসম্পন্ন। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র থেকে এ ঘোষণা করা হলো যে আমাদের বংশে একজন নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্র কালাম আসে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করবো। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোন-দিনও আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবো না।

এই হচ্ছে কোরআনের প্রকাশ্য মু'জিযা, যা শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। (খাসায়েসে-কুব্রা)

তৃতীয় কারণ ঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা—কোরআন ঘোষণা করেছে যে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমত পারস্যবাসী

জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজি ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজির শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ্য এ মাল গ্রহণও করেন নি। কেননা, এরূপ বাজি ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ ঃ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খৃস্টানদের আলেমগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল (সা)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেন নি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেন নি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহ্র কালাম ছাড়া কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ ঃ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরশাদ হয়েছে ঃ

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ـ

অর্থাৎ—যখন তোমাদের দু'দল মনে মনে ইচ্ছা করল যে, পশ্চাদপসরণ করবে। আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ـ

অর্থাৎ—তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ্ কেন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এসব এমন কথা যা সংশ্লিষ্ট লোকেরা কারো কাছে প্রকাশ করেনি, বরং কোরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে।

ষষ্ঠ কারণ ঃ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে; সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا — তারা কখনও তা চাইবে না।

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য, যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কোরআনের এরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহালা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কোরআনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি।

সপ্তম কারণ ঃ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মু'মিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতআম (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুযুর (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শোনেন। হুযুর (সা) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শোনার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ ۔ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

অর্থাৎ—তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অষ্টম কারণ ঃ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তক হোক না কেন, বড়জোর দু-চার বার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও মনে আগ্রহ জন্মে। কোরআন আল্লাহ্র কালাম বলেই এরূপ হয়ে থাকে।

নবম কারণ ঃ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেমও যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক-দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নযীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন্ ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল। এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ

আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদা-নাখাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেয একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল-কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহ্রই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ্র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জিযার পর কোরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণঃ কোরআনে এল্‌ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্ব পরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নযীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেওয়ার নযীরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোন লোকই

কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জিযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি এমন অনেক অমুসলিম লোকও কোরআনের এ নযীরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডঃ মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা-ভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্য বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।"

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্য সাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খৃস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি।

যে যুগে মুসলমান কোরআনের সাথে অপরিচিত, এর শিক্ষা থেকে দূরে এবং এর তিলাওয়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে গাফেল ছিল মুসলমানদের ওপর কোরআনের প্রভাবের কথা তারা সে যুগে স্বীকার করেছে। আফসোস, এ ভদ্রলোক যদি সে যুগটি দেখতেন, যাতে মুসলমানগণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের নির্দেশের প্রতি আমল করেছেন এবং মুখে মুখে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন!

অনুরূপভাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখকও একই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মিঃ উইলিয়াম ম্যুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ পরিষ্কারভাবে তা স্বীকার করেছেন। আর ডক্টর শিবলী শামীল এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই রচনা করেছেন।

তাতে কোরআন আল্লাহ্র কালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন্ত মু'জিযা হওয়া সম্পর্কে দশটি কারণ পেশ করা হয়েছে। সবশেষে আলোকপাত করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন জন্মগত ইয়াতীম। সারা জীবনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন নি। কোন বই-পুস্তক ও কাগজ-কলম তিনি হাতে নেন নি। এমনকি নিজের নামটুকু পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। তাঁর স্বভাব এত শান্তিপ্রিয় ছিল যে, খেলাধুলা, রং-তামাশা, ঝগড়া-বিবাদে কোন দিনও যেতেন না। কবিতা বা কোন সাহিত্য সভায়ও তিনি যোগ দেন নি। কোন সভা-সমিতিতে কোন ভাষণও দেন নি। এমতাবস্থায়

চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি বয়সের শেষার্ধে উপনীত, যে সময় শিক্ষা লাভ করার বয়স শেষ হয়ে যায়, সে সময় তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা অনন্য জ্ঞান-গরিমা এবং অসাধারণ ভাষা-শৈলীতে পরিপূর্ণ। যা কোন যুগপ্রবর্তক, কোন জ্ঞানী কিংবা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। এসব কালাম দ্বারা তিনি আরবের বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতবর্গকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম নয়, তবে এর একটি ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ব্যাপারে আরব সমাজ বাস্তবিকপক্ষেই অপারক ছিল।

সমগ্র জাতির যারা তাকে আল্-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তাঁকে সম্মান করতো, এ কালামের প্রচারে অবতীর্ণ হবার পর সে সমস্ত লোকই তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। এ কালামের প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-দৌলত, রাজত্ব এবং জাগতিক জীবনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করারও ওয়াদা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এর কোন একটিও গ্রহণ করেন নি। সমগ্র জাতি তাকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয়, আর তিনি তা অম্লান বদনে সহ্য করে নেন, কিন্তু এ কালামের তবলীগ ছাড়েন নি। জাতি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, অবশেষে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা তাঁকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সমগ্র আরববাসী মুশরিক ও আহ্‌লে-কিতাব তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছে। তাঁর শত্রুরা সব কিছুই করেছে, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। বরং যে পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর নযীর নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত হাদীসই কোরআন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরশাদ হয়েছে—

قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۔

অর্থাৎ—যারা পরকালে আমার সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা বলে—এরূপ অন্য আর একটি কোরআন রচনা করুন অথবা এর পরিবর্তন করুন। আপনি বলুন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

একদিকে কোরআনের এ প্রকাশ্য মু'জিযা, যা এর আল্লাহ্‌র কালাম হওয়াই

স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, অপরদিকে এর বিষয়বস্তু, তথ্যাদি ও রহস্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে আরো আশ্চর্য হতে হয়।

কোরআন অবতরণের প্রথম যুগ তো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, প্রকাশ্যে এ সব বাক্য পেশ করাও সম্ভব হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে মানুষকে এর প্রতি আহবান জানাতে থাকেন। অতঃপর সীমাহীন গঞ্জনা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করেন। তখন কোরআনের নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

মদীনায় হিজরত করার পর মাত্র দশটি বছর তিনি সময় পান; যাকে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন যুগ বলা চলে। এর ফলে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করার চেষ্টা ও গঠনমূলক কিছু কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

কিন্তু এ দশ বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, প্রথম ছয় বছর শত্রুদের বিরামহীন হামলা, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং মদীনার ইহুদীদের চক্রান্ত প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোরআনের নির্দেশে এমন একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা আজও দুনিয়ায় কোন মুক্তিকামী মানব সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আদর্শ হয়ে আছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ এ ছয় বছরে সংঘটিত হয়েছে। বদর, ওহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধ সবই এ ছয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে দশ বছরের জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি লেখা হয়। আর মাত্র এক বছর আরবের কুরাইশগণ এ চুক্তির শর্তাদি পালন করে। এক বছর পরই তারা এ সন্ধিও ভঙ্গ করে ফেলে এবং পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে বাস্তবায়িত করার পরিপূর্ণ সুযোগ রসূল (সা) মাত্র দু'এক বছরই পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আশপাশের বড় বড় রাজা-বাদশাহের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেন এবং কোরআনী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আর হুযুর (সা) তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত এ স্বাধীনতার সুযোগ পান মাত্র চার বছর। এর মধ্যে মক্কা বিজয়ের জিহাদ উপস্থিত হয় এবং মক্কা জয় হয়।

এখন চার বছরের স্বল্প সময়কে সামনে রেখে কোরআনের প্রয়োগ ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, সে সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বত্র কোরআনী আইন-কানুনের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। একদিকে রোম এবং অপরদিকে ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এ কোরআনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর জাতি ছিল এমনই এক জনগোষ্ঠী, যারা কোনদিন কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা কোন রাজা-বাদশাহ্‌র শাসন মেনে চলেনি। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়া ছিল বিরুদ্ধাচরণে কৃতসংকল্প। আরবের মুশরিক এবং ইহুদী-নাসারাগণ তাঁর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এসব কথা বাদ দিয়ে ধরা যাক যে, যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ নাও হতো, যদি সমস্ত লোক বিনা বাক্যব্যয়ে কোরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতো, তবুও একটা নতুন দর্শন, নতুন জীবনবিধান, আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতি প্রথমে সংকলন করা, এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল করা এবং তৎপর সে নিয়ম-নীতির আলোকে একটি আদর্শনিষ্ঠ নতুন জাতির গোড়াপত্তন করা আর সে জাতিকে একটা পরিপূর্ণ আদর্শবাদী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার জন্য কত সময়, জনবল, অর্থ ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির প্রয়োজন হতো! সেরূপ সুযোগ-সুবিধা কিংবা উপায়-উপকরণ কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে-কেরামের আয়ত্তাধীন ছিল? সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল এবং আইনের শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটা জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা সভ্য জনসমাজে রূপান্তরিত করা এবং পরিপূর্ণভাবে সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সুসংহত করার মত কোনরূপ জাগতিক উপকরণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাতে নযীরবিহীন সাফল্য একথাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহের দ্বারাই এমনটি সম্ভবপর হয়েছিল। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান কোরআনের এই দাওয়াত আল্লাহ্‌রই বিশেষ কুদরতে এমন অবিশ্বাস্যভাবে আরব সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

কোরআনের অনন্যসাধারণ মু'জিযা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনাসাপেক্ষ বিষয়। যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

সর্বপ্রথম হিজরী তৃতীয় শতকে আল্লামা জাহিয এ বিষয়ের উপর 'নয্‌মুল কোরআন' নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর হিজরী চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে আবদুল্লাহ্ ওয়াসেতী 'এ 'জাযুল-কোরআন' নামে আর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। একই শতাব্দীতে ইবনে ঈসা রাব্বানী 'এ' জাযুল-কোরআন' নামে আর একটা ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। কাজী আবূ বকর বাকিল্লানী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে 'এ' জাযুল-কোরআন' নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'আল্-এতকান' এবং 'খাসায়িসে-কুবরা'

নামে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তফসীরে কবীরে এবং কাযী আয়ায 'শেফা' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আধুনিককালে মুস্তফা সাদেক রাফেয়ীর 'এ'জাযুল-কোরআন' এবং আল্লামা রশীদ রেযা মিসরীর 'আল্ওয়াহ্য়্যাল মুহাম্মদী' এ বিষয়ের ওপর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রচিত 'এ'জাযুল কোরআন' নামক পুস্তিকাটিও এ বিষয়ে একটা অনবদ্য সংযোজন।

এটাও কোরআনের আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর এক একটি বিষয় সম্পর্কে তফসীর গ্রন্থ ছাড়াও এত বেশী কিতাব রচিত হয়েছে, যার নযীর অন্য কোন কিতাবের বেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোট কথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কোরআন আল্লাহ্রই কালাম এবং রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

কিছু সন্দেহ ও তার জবাব ঃ কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, এমনও তো হতে পারে যে, কোরআনের মোকাবিলায় সে যুগে কিছু কিছু গ্রন্থ কিংবা অনুরূপ কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের ব্যবধানে সেগুলো আর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে পারেনি? কিন্তু, যদি সামান্য ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থা রেখেও চিন্তা করা যায়, তবে এ ধরনের কোন সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। কেননা, সকলেই জানেন যে, কোরআন যখন নাযিল হয়, তখন কোরআনকে মান্য করার মত লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। অপরদিকে যারা কোরআনকে স্বীকার করতো না, অধিকন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই তাদের সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করতো, তাদের সংখ্যার কোন অভাব ছিল না। এতদ্ব্যতীত সূচনাকাল থেকেই কোরআনের অনুসারিগণের হাতে প্রচারমাধ্যম এবং মুদ্রণ-প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। এ অবস্থায়ও যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হতে থাকলো, তখন কোরআনের দুশমনরা এ আওয়াজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, রক্ত দিয়েছে জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, এমতাবস্থায় কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে যদি কেউ কোন গ্রন্থ বা তার সূরার অনুরূপ কোন রচনা পেশ করতে সমর্থ হতো, তবে বিরুদ্ধবাদীরা যে কতটুকু আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করতো এবং সর্বতোভাবে তা প্রচার করতে সচেষ্ট হতো,

তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, অনুরূপ কোন গ্রন্থের সন্ধান আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু কোন যুগে যদি কোরআনের অনন্য মর্যাদাকে খাটো করে এর মোকাবিলায় কোন রচনা পেশ করা হতো, তবে সে গ্রন্থ রচনার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম আলেমগণও অনেক জবাবী কিতাব অবশ্যই রচনা করতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন কিতাবের সন্ধানও কোথাও পাওয়া যায়নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইয়ামান-এর মুসায়লামাতুল-কায্যাবের ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখিত রয়েছে। তাতে জানা যায়, কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে সে কিছু বাক্য অবশ্য রচনা করেছিল। কিন্তু সেগুলোর পরিণতি কি হয়েছিল, তা কারো অজানা নয়। তার কওমের লোকেরাই সেগুলো তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। অধিকন্তু তার রচিত সেই বাক্যগুলো ছিল এতই অশ্লীল, যা কোন রুচিবান মানুষের সামনে উদ্ধৃতও করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসায়লামাহ্ কায্যাব রচিত সেসব বাক্য বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আজো পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেগুলো উদ্ধৃত করা হয়। সুতরাং যদি কোরআনের মোকাবেলায় মহৎ কোন রচনার অস্তিত্ব থাকতো, তবে তাও নিশ্চয়ই ইতিহাসে কিংবা আরবী সাহিত্যের ধারা-বর্ণনায় সংরক্ষিত হতো। অন্তত কোরআন বিরোধীদের প্রচেষ্টায় সে সব কালামের প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই হতো।

যেসব লোক কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতো, তাদের অনেক সন্দেহ-সংশয়ের কথা খোদ কোরআনেই উল্লেখিত হয়েছে এবং সাথে সাথে জবাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায় না, যাতে কোন কালাম কোরআনের মোকাবিলায় কেউ পেশ করেছে।

রোম দেশীয় একজন ক্রীতদাস মদীনায় কামারের কাজ করতো। তওরাত এবং ইনজীল সম্পর্কে তার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। সে মাঝে মাঝে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে যাতায়াত করতো। এ সূত্র ধরেই বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করে দিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ গোলামের মুখে তওরাত-ইনজীলের কথা শুনে নিয়ে তাই কোরআনের নামে প্রচার করেছেন। খোদ কোরআন শরীফেই এ অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করে জবাব দেওয়া হয়েছে—"যে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তোমরা এমন অমূলক প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়েছ, সে তো একজন অনারব; সে ব্যক্তির পক্ষে কি কোরআনের অনুরূপ ভাষাশৈলী আয়ত্ত করা এবং প্রকাশ করা সম্ভব?" সূরায়ে নাহ্লের ১০৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।

لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ—ইসলামের দুশমনেরা যা বলে তাদের সে বক্তব্য আমাদের জানা আছে—"এ কোরআন আপনাকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে দেয়, অথচ যে লোকের প্রতি এ বিষয়টিকে জড়িত করে, সে হচ্ছে অনারব—আজমী। আর কোরআন হল একটা একান্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষার কালাম।"

অনেকে কোরআন সম্পর্কে বলেছে— لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا অর্থাৎ —আমরাও ইচ্ছা করলে কোরআনের অনুরূপ কালাম বলতে পারতাম।

কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, তাহলে ইচ্ছাটা করই না কেন? কোরআনের মোকাবিলায় গোটা শক্তি তো নিয়োগ করলেই—জানমাল পর্যন্ত বিসর্জন দিলে। যদি কোরআনের মত কোন কালাম লেখার বা বলার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তাহলে কোরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তরে এর মত একটা কালাম তৈরী করে বিজয়ের শিরোপাটা নিয়েই নাও না কেন?

সারকথা, কোরআনের এ দাবীর বিরোধীরা যে একান্ত ভদ্রজনোচিত নীরবতা অবলম্বন করেছেন তাই নয়, বরং তার মোকাবিলায় যা কিছু তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে তাই বলেছে। কিন্তু তথাপি একথা কেউ বলেনি যে, আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি কোরআনের মত অমুক কালামটি রচনা করেছে—কাজেই কোরআনের এ স্বাতন্ত্র্যের দাবীটি (নাউযুবিল্লাহ্) ভুল।

'হুযুর আকরাম (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সামান্য কয়েক দিনের জন্য শাম দেশে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন পথে পাদ্রী বুহায়রার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বুহায়রা ছিলেন তাওরাতের বিজ্ঞ পণ্ডিত। কোন কোন বিদ্বেষবাদীর এমন দুর্মতিও হয়েছে যে, তাদের মতে তিনি নাকি তারই কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, একদিনে এবং একবারের সাক্ষাতে তার কাছ থেকে এ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান, ভাষার অলঙ্কার-শৈলী, অকাট্যতা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেমন করে শিখে নিতে পারলেন?

ইদানীংকালে কোন কোন লোক প্রশ্ন তুলেছে যে, কোন কালামের অনুরূপ কালাম তৈরী করতে না পারাটাই তার আল্লাহ্র কালাম বা মু'জিযা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। এমনও তো হতে পারে যে, কোন বিজ্ঞ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ গদ্য কিংবা পদ্য লিখবেন, যার অনুরূপ রচনা অপর কারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়?

সা'দী শীরাযীর 'গুলেস্তাঁ ফয়যীর 'নোক্‌তাবিহীন তফসীর' প্রভৃতিকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা হয়। তাই বলে এগুলো কি কোন মু'জিযা?

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সা'দী এবং ফয়যীর কাছে জ্ঞানার্জন ও রচনার কত বিপুল উপকরণ উপস্থিত ছিল, কত সময় ধরে তাঁরা জ্ঞানার্জন করেছিলেন ; বছরের পর বছর তাঁরা মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনে পড়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন, যুগের পর যুগ পরিশ্রম করেছেন, বড় বড় আলেম-উলামার দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে কাটিয়েছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম আর মাথাকুটার পর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ফয়যী বা হারীরী অথবা মুতানব্বী কিংবা অন্য কেউ আরবী ভাষায়, সা'দী প্রমুখ ফারসী ভাষায় এবং মিল্টন ইংরেজী ভাষায় কিংবা হোমার গ্রীক ভাষায় অথবা কালীদাস সংস্কৃতে এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিখেন যে, তাদের রচনা অন্যদের রচনা অপেক্ষা বহু উন্নত, তথাপি তা আশ্চর্যের বিষয় মোটেই নয়।

মু'জিযার সংজ্ঞা হল এই যে, তার প্রচলিত নিয়ম-রীতি ও উপায়-উপকরণের মাধ্যম ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু উল্লেখিত মনীষীবৃন্দের যথারীতি জ্ঞানার্জন, ওস্তাদ-শিক্ষকদের সাথে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘকালের অনুশীলন কি তাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কিংবা অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উপকরণ ছিল না? তাদের কালাম যদি অন্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? অবশ্যই যে লোক কোন দিন কাগজ-কলম, বই-পুস্তক স্পর্শ করেও দেখেন নি, কোন মক্তব-মাদ্রাসার ধারে-কাছেও যান নি, তিনি যদি পৃথিবীর সামনে এমন কোন কালাম তুলে ধরেন, হাজারো সা'দী আর লাখো ফয়েযী যাতে আত্মবিসর্জন দেওয়াকে গর্ব বলে মনে করে এবং নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে তারই অবদান বলে মেনে নেয়, তবে বিস্ময়ের বিষয় সেটাই। তাছাড়া সা'দী কিংবা ফয়েযীর কালামের মত কালাম উপস্থাপন করার প্রয়োজন বা কি থাকতে পারে? তাঁরা কি নবুয়তের দাবী করেছেন? তাঁরা কি নিজেদের কালামের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের মু'জিযা বলে দাবী করেছেন? কিংবা গোটা বিশ্বকে কি তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, আমাদের কালামের সমতুল্য কোন কালাম উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, যার ফলে মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কালাম উপস্থাপনে বাধ্য ছিল?

তদুপরি কোরআনের ভাষা ও অলঙ্কার ; বাকশৈলী আর বিন্যাস ও গ্রন্থনাই যে অনন্য তাই নয়, বরং মানুষের মন-মস্তিষ্কে এর যে প্রভাব তা আরও বিস্ময়কর নযীর-বিহীন। যার ফলে সমকালীন জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মন-মস্তিষ্কই বদলে গেছে।

মানব চরিত্রের মূল কাঠামোই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আরবের অমার্জিত-বেদুঈনরা তারই দৌলতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় বিদগ্ধ হয়ে উঠেছিল।

তার এই বিস্ময়কর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃতি শুধু মুসলিমরাই দেননি, বরং বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম মনীষীও দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের নিবন্ধসমূহ একত্রিত করলে একটা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত হতে পারে। আর হাকীমুল-উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এ প্রসঙ্গে 'শাহাদাতুল-আক্ওয়াম আলা সিদ্কিল ইসলাম' নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এখানে তারই কয়টি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে ঃ

ডঃ গোস্তাওলি তাঁর 'আরব সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের স্বীকৃতি নিম্নরূপ বক্তব্যের মাধ্যমে দিয়েছেন ঃ

ঃ "ইসলামের সে পয়গম্বর নবীয়ে-উম্মীরও একটি উপাখ্যান রয়েছে, যার আহ্বান গোটা একটি মূর্খ জাতিকে, যারা তখন পর্যন্তও কোন রাষ্ট্রের আওতায় আসেনি, জয় করে নিয়েছিল এবং এমন এক পর্যায়ে তাদের উঠিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারাই বিশ্বের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। এখনও সেই নবীয়ে উম্মীই আপন সমাধির ভেতর থেকে লাখো আদম-সন্তানকে ইসলামের বাণীতে বদ্ধমূল করে রেখেছেন।"

মিঃ গুডওয়েল যিনি নিজ ভাষায় কোরআনের অনুবাদও করেছেন, লিখেছেন ঃ "আমরা যতই এ গ্রন্থকে (অর্থাৎ কোরআনকে) উল্টে-পাল্টে দেখি, প্রথম অধ্যয়নে তার প্রতি যে অনীহা থাকে, সেগুলোর উপর নব নব প্রক্রিয়ার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সহসাই সেগুলো আমাদের বিস্মিত করে, আকৃষ্ট করে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করে ছাড়ে। এর বর্ণনাভঙ্গি, এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ, মার্জিত, মহৎ ও দীক্ষাপূর্ণ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এর বক্তব্য সুউচ্চ শীর্ষে গিয়ে আরোহণ করে। সারকথা, এ গ্রন্থ সর্বযুগে নিজের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।" (শাহাদাতুল-আকওয়াম, পৃ. ১৩)

মিসরের প্রখ্যাত লেখক আহমদ ফাতহী বেক্ যাগলুল ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে মিঃ কাউন্ট হেজভীর গ্রন্থ 'দি ইসলাম'-এর অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থটি ছিল ফরাসী ভাষায়। এতে মিঃ কাউন্ট কোরআন সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ ধরনের কালাম এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে কেমন করে বেরুতে পারে, যিনি ছিলেন একান্তই নিরক্ষর। সমগ্র প্রাচ্য স্বীকার করে

নিয়েছে যে, গোটা মানবজাতি শব্দগত ও মর্মগত উভয় দিক দিয়েই এর সামঞ্জস্য উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এটা সে কালাম, যার রচনাশৈলী উমর ইবনে খাত্তাবকে অভিভূত করে দিয়েছিল, যাতে তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা সেই বাণী যখন ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এতে বর্ণিত বাক্যগুলো হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে আবৃত্তি করেন, তখন তাঁর চোখগুলো একান্ত অজান্তেই অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত বিশপও এই বলে চিৎকার করে ওঠেন, 'এ বাণী সেই উৎসমূল থেকেই নিঃসৃত, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহ।" (শাহাদাতুল আকওয়াম, পৃ. ১৪)

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার ১৬তম খণ্ডের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছেঃ "কোরআনের বিভিন্ন অংশের মর্ম অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক আয়াত ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণাসম্বলিত, অলৌকিক নিদর্শনাবলী, ইতিহাস, নবীদের প্রতি আগত আল্লাহ্‌র বাণী প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব, অনুগ্রহ ও সত্যতার স্মারক হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে এক ও সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ করা হয়েছে। পৌত্তলিকতা ও ব্যক্তি উপাসনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে না-জায়েয বা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে একথা একান্তই যথার্থ যে, তা সমগ্র বিশ্বে বর্তমান গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাধিক পঠিত হয়।"

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ গীবন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন'-এর ৫ম খণ্ড, ৫০তম পরিচ্ছেদে লেখেনঃ

"আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকায় একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণ ও মৌলিক বিধান। তাছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতিমালাই নয় বরং সে সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান ও সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারই উপর নির্ভর করা হয়, যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং যা মানুষের প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ শরীয়ত এমন সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত যে, সমগ্র বিশ্বে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

এখানে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌দের বক্তব্য ও স্বীকৃতিসমূহের সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়াই উদ্দেশ্য, যাতে প্রমাণিত

হয় যে, ভাষার অলঙ্কার এবং বাকশৈলীর দিক দিয়ে কিংবা উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হিসাবে অথবা জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআনের অনন্যতা ও অনুপমতার স্বীকৃতি শুধুমাত্র মুসলমানরাই নয়, বরং সর্বযুগের অমুসলমান লেখকরাও দিয়েছেন।

কোরআন সমগ্র বিশ্বকে নিজের মত কোন কালাম উপস্থাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু তা কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আজও মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা দেখিয়ে দিন, যাতে একজন মহা-দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে এবং তিনি সমগ্র বিশ্বের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন আর তাঁর সম্প্রদায়ও ছিল তেমনি গেঁয়ো-অর্বাচীন, অথচ তিনি এত অল্প সময়ে তাঁর শিক্ষাকে এ হেন ব্যাপকতা দান করতে পেরেছেন এবং তার কার্যকারিতাকেও এতটা বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তার কোন উদাহরণ আজকের 'সুদৃঢ়' ও 'সুসংহত' ব্যবস্থাসমূহে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর তৎকালীন ইতিহাসে যদি তার কোন নযীর না-ও থেকে থাকে, কিন্তু সমকালের আলোকোজ্জ্বল, উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন জগতেরই না হয় কেউ তেমনটি উপস্থাপন করে দেখাক; একা সম্ভব না হলে স্বীয় জাতি, সম্প্রদায়, তথা সমগ্র বিশ্ব-সম্প্রদায়কে নিয়ে হলেও এমন একটি উদাহরণ পেশ করুন।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -

অর্থাৎ, "তোমরা যদি তার উদাহরণ পেশ করতে না পার, আর তোমরা তা কস্মিনকালেও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যা তৈরী করা হয়েছে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য।"

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ
ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا
بِهٖ مُتَشَابِهًا ۭ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ۝

(২৫) আর হে নবী (সা) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এত অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি সে সব লোককে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করেছে, এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এমন বেহেশত রয়েছে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে যতবারই তাদেরকে কোন ফলজাত খাবার প্রদান করা হবে, ততবারই তারা এগুলো পূর্বপ্রাপ্ত ফলের অনুরূপ বলে মন্তব্য করবে। বস্তুত প্রতিবারেই তাদেরকে একই ধরনের ফল দেওয়া হবে এবং বেহেশতে তাদের স্ত্রীগণ সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পূত-পবিত্র হবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে। প্রতিবার একই ধরনের ফলপ্রাপ্তি পরিপূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভে সহায়ক। (প্রতিবার অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ফল দেখে তারা মনে করবে, এত প্রথমবারে প্রাপ্ত ফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের হবে বলে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিবর্ধক বলে প্রতিপন্ন হবে।)

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল কোরআন করীমের প্রতি অবিশ্বাসীদের শাস্তির বর্ণনা। আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাকের অনুসরণকারীদের জন্য বেহেশতে সংরক্ষিত বিস্ময়কর ও অভিনব ফলমূল ও অনিন্দ্যসুন্দরী স্বর্গীয় অপ্সরীদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে।

জান্নাতে পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণমুক্ত এবং প্রস্রাব পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বস্তু থেকে একেবারে উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ-সমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয়, যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে এবং জান্নাতবাসীরা অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করত বিমল আনন্দস্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সৎকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবলমাত্র ঈমানই স্থায়ী দোযখবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মু'মিন যত পাপীই হোক না কেন, কোন না কোন সময় দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সৎকাজ ভিন্ন কেউ দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। (রূহুল-বয়ান)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا
فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۠ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

(২৬) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদূর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুত যারা মু'মিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাফির তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহ্র মতলবই বা কি ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন। আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না। (২৭) (বিপদগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরআন পাক যে আল্লাহ্র বাণী সে সম্পর্কে এ আপত্তি উত্থাপন করে কোন কোন বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, এতে বিভিন্ন উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মশা-

মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। যদি এটি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র বাণী হত, তবে এতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তুর উল্লেখ থাকত না। (এর উত্তরে বলা হয়েছে যে,) হাঁ! যথার্থই আল্লাহ্ পাক মশা বা ততোধিক নগণ্য বস্তুর দ্বারাও উপমা প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে (যাই হোক না কেন) তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমাগুলো অত্যন্ত স্থানোপযোগী ও সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত। বাকী রইল কাফিরদের কথা—বস্তুত সর্বাবস্থায়ই তারা বলতে থাকবে যে, এরূপ তুচ্ছ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ পাক কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ পাক অনেককে পথভ্রষ্ট করেন। আবার এরই মাধ্যমে অনেককে হেদা-য়েত প্রদান করেন। এতদ্বারা নিছক অবাধ্যজন ব্যতীত অন্য কাকেও পথচ্যুত করেন না। যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে দৃঢ়ভাবে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (অর্থাৎ, আযল দিবসের অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে প্রত্যেকের আত্মাই আল্লাহ্ পাককে স্বীয় রব বা পালন-কর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল) এবং আল্লাহ্ পাক যেসব সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে (শরীয়ত অনুমোদিত সম্পর্কই এর অন্তর্ভুক্ত। চাই তা আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কই হোক; অথবা আত্মীয়-স্বজন বা সমগ্র মুসলমান অথবা বিশ্বমানবের মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক সম্পর্কই হোক) এবং ভূপৃষ্ঠে কলহ সৃষ্টি করে। (কুফর, আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণ ও অংশীদার নিরূপণ অশান্তি তো বটেই, তা ছাড়া তা কুফরেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। অত্যাচার, অবিচারও এ অশান্তির অন্তর্ভুক্ত।) ফলত এরাই পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। (ইহলৌকিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারলৌকিক সুখ ভোগের উপকরণ—সবই এদের নাগালের বাইরে। কারণ, হিংসুকের পার্থিব জীবন সর্বদা নানাবিধ তিক্ততা ও প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ থাকে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কয়েক আয়াত পূর্বে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহ্‌র বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহবান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোর-আন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বস্তুত

এটা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ গ্রন্থ প্রকৃতই যদি আল্লাহ্র বাণী হতো, তবে এরূপ নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বস্তুর আলোচনা স্থান পেত না। কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা অনুরূপ নগণ্য বস্তুর মাধ্যমে দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। এতদুদ্দেশ্যে কোন ঘৃণ্য ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধের মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক এ ধরনের বস্তুসমূহের উল্লেখে মোটেও লজ্জাবোধ করেন না। সাথে সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের নির্বুদ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্রেক শুধু তাদের মনেই হতে পারে, যাদের মন-মস্তিষ্ক অবিরাম খোদাদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। মু'মিনদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্রেক কখনো হতে পারে না।

অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায়—এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য যোগায় হেদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোরআনে বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভংগ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ্ পাক অক্ষুণ্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন. তারা তা ছিন্ন করে! যার পরিণামস্বরূপ ধরার বুকে অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا—এর অর্থ মশা বা ততোধিক। এখানে অধিক বলে নিকৃষ্টতায় অধিক বুঝানো হয়েছে।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا কোরআন পাক এবং এতে বর্ণিত উপমাসমূহের মাধ্যমে মানবকুলের হেদায়েতপ্রাপ্তি তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অনেককে বিপথগামী করার অর্থ কোরআন একদিকে যেমন তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারী ও তার অনুসারীদের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম, অপরদিকে তার বিরুদ্ধাচারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য পথচ্যুতির কারণও বটে।

فِسْقٌ—وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ —এর শাব্দিক অর্থ বের হয়ে যাওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাওয়াকে فُسُوقٌ বলা হয়। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্যের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাওয়া মহান স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণের কারণেও হতে পারে, আচার-আচরণ ও কর্মগত অবাধ্যতার কারণেও হতে পারে। এজন্য فَاسِقٌ শব্দটি كَافِرٌ -এর স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআনের অধিকাংশ জায়গায় فَاسِقِيْنَ শব্দ كَافِرِيْنَ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পাপী মু'মিন-দেরকেও فاسق (ফাসিক) বলে সম্বোধন করা হয়। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় সাধারণত ফাসিক (فاسق) শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁদের পরিভাষায় ফাসিককে (فاسق) কাফির (كافر)-এর সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা থেকে তওবা করে না, বা অবিরাম সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার ফলে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, সে ব্যক্তি ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় ফাসিক (فاسق) বলে পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের পাপ ও গর্হিত কাজ ঔদ্ধত্য সহকারে প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে, সে ফাজির (فاجر) বলে আখ্যায়িত।

সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, কোরআন পাকে বর্ণিত এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনেকেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়, আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে পথচ্যুতি! বিপথগামী শুধু সেসব লোকই হয়, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের আওতা অতিক্রম করে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সামান্যতম খোদাভীতিও রয়েছে, তারা তা থেকে হেদায়েতই লাভ করে থাকেন।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ

কোন বিষয়ে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আ'হ্‌দ্ (عهد) বলা হয়। এ চুক্তি বা অঙ্গীকারকে যখন শপথের মাধ্যমে অধিকতর দৃঢ় করা হয়, তখন তাকে বলা হয় মীসাক (ميثاق)।

এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবং কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোরআনের বর্ণিত উপমাসমূহের যৌক্তিকতা প্রসংগে মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করেছে, তার ফলে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণে পরাঙ্মুখ, কেবল তারাই দ্বিবিধ কারণে বিপথগামী হবে।

১ম কারণ—এ বিরুদ্ধাচারিগণ সৃষ্টির আদিলগ্নে আল্লাহ্ পাকের সাথে সমগ্র মানব কর্তৃক কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। মানব জাতি এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মহান স্রষ্টা তাদের আত্মাগুলোকে একত্রিত করে সবার সামনে প্রশ্ন রেখে-ছিলেন যে, "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?" প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সবাই সমস্বরে স্বীকার করেছিল, "হাঁ—মহান আল্লাহ্ই আমাদের পালনকর্তা।"—আমরা যেন তাঁর আনুগত্যের সীমা এক বিন্দুও লঙ্ঘন না করি, এই ছিল এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী দাবী।

মানব জাতিকে তাদের এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির সবিস্তার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে পবিত্র আসমানী গ্রন্থসহ মহান নবী ও রসূলগণের আবির্ভাব ঘটেছে। যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে, সে যে কোন পয়গম্বর বা আসমানী গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবে, এ আশা কিভাবে করা যায়।

২য় কারণ—তারা সেসব সম্পর্কই ছিন্ন করেছে, যেগুলো আল্লাহ্ পাক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, নানাবিধ কাজ-কর্মের অংশীদার, গোটা মুসলিম জাতি বা বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের যত প্রকার সম্পর্কের কথা বলেছেন, সেসবই আলোচ্য সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পর্ক যথার্থভাবে বজায় রাখার নামই ইসলাম। এক্ষেত্রে সামান্যতম অমনোযোগিতা ও অসাবধানতার দরুন বিশ্বময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য বাক্যের শেষাংশে বলা হয়েছে وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, "এরা ধরার বুকে অশান্তি ঘটায়। সবশেষে এদের করুণ পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "এরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।"

উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নয় إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ত্রুটি বা অপরাধ নয়—কিংবা বক্তার মহান মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। কোরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের উলামায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন. মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি।

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ—(আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে—) এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লংঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে।

সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শরীয়তী বিধান মেনে চলা ওয়াজিব এবং তা লংঘন করা মারাত্মক অপরাধ ঃ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (এবং আল্লাহ্ পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে।) এতে বোঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমষ্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে) বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত এ হল যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ।

أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ—(তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত।) এ বাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লেখিত নির্দেশাবলী অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ
سَمٰوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার

মৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য—যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সববিষয়ে অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আচ্ছা!) তোমরা কেমন করে আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার, (অর্থাৎ—তাঁর দয়া ও অনুগ্রহরাজির কথা ভুলে অন্যকে পূজ্য বলে মেনে নাও,) অথচ (একমাত্র তিনিই যে উপাসনা ও আরাধনার অধিকারী এ সম্পর্কে অজস্র জাজ্বল্যমান ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যথা—বীর্যে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে) তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণদান করলেন। পরে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। অবশেষে (হিসাব-নিকাশের জন্য হাশর প্রান্তরে) তারই সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। সে মহান সত্তাই ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সে সব তোমাদের কল্যাণার্থ সৃষ্টি করেছেন। (এ কল্যাণ ব্যাপক। পানাহার সম্পর্কেও হতে পারে বা বেশভূষা সম্পর্কেও হতে পারে, অথবা বিয়ে-শাদী অথবা আত্মার পরিপুষ্টি ও সজীবতা সঞ্চার সম্পর্কেও হতে পারে। এদ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মানুষের উপকারে আসতে পারে না, জগতে এমন কোন বস্তুই নেই। কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সব ধরনের ব্যবহারই ঠিক ও ধর্মসম্মত। মারাত্মক কোন বিষও মানুষের কোন উপকারে আসে না, এমন নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে তা খেয়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।) অতঃপর তিনি আসমানের (সৃষ্টি ও পরিপূর্ণতা বিধানের) প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং (নিখুঁত ও সুবিন্যস্তভাবে) সাত (স্তরে) আসমান তৈরী করেন। আর তিনি তো সব বিষয়েই অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব এবং হুযুরের রিসালাত সম্পর্কে প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি এবং সত্যবিমুখ বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র অগণিত দয়া ও সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা

সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে! এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্তত দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্যকর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ্ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক। এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ (তোমরা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করতে পার?) এরা যদিও সরাসরি আল্লাহ্র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু আল্লাহ্র রসূলের প্রতি অবিশ্বাস পোষণকে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্র প্রতিই অবিশ্বাস বলে মনে করে তাদেরকে এরূপ সম্বোধন করা হয়েছে।

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ এখানে أَمْوَاتٌ শব্দটি مَيِّتٌ -এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে مَيِّتٌ বলা হয়—আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ্ সেসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত করেছেন অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।) অর্থাৎ—যিনি তোমাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অণুকণাগুলো সমন্বিত করে

তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই এ মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের শরীরের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

প্রথম মৃত্যু হল তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের; নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুত তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

প্রথম মৃত্যু ও প্রথমবার জীবন লাভের মাঝে যেহেতু কোন দূরত্ব ছিল না, সেজন্য ف বর্ণ যোগ করে فَاَحْيَاكُمْ বলা হয়েছে। আর ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অনুরূপভাবে এ মৃত্যু ও কিয়ামত দিবসের পুনরুজ্জীবনের মাঝে যেহেতু বেশ দূরত্ব রয়েছে, সুতরাং সেখানে ছুম্মা (ثُمَّ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—যার অর্থ সুদূর ভবিষ্যৎ। ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (অতঃপর তোমাদেরকে সে মহান সত্তার সমীপে ফিরিয়ে নেয়া হবে।) এর অর্থ হল হিসাব নিকাশ ও কিয়ামতের সময়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর সে সব দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের নিজস্ব সত্তার সাথে যার সম্পর্ক এবং যা যাবতীয় করুণা ও দয়ার মূল ভিত্তি। আর তা হল মানুষের জীবন। ইহকালে ও পরকালে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে আল্লাহ্ পাকের যেসব দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, তা সবকিছুই এ জীবনের উপর নির্ভরশীল। জীবন না থাকলে আল্লাহ্র কোন অনুগ্রহের দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায় না। কাজেই জীবন যে আল্লাহ্ পাকের দয়া তা একান্ত সহজবোধ্য ব্যাপার। কিন্তু এ আয়াতে মৃত্যুকেও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, এই পার্থিব মৃত্যু সে অনন্ত জীবনেরই প্রবেশদ্বার, যার পরে আর মৃত্যু নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহবিশেষ।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রসূলে পাক (সা)-এর রিসালতের প্রতি এবং কোরআন যে আল্লাহ্র বাণী সে সম্পর্কে অবিশ্বাসী, সে দৃশ্যত আল্লাহ্র অস্তিত্বে ও মহত্বে অবিশ্বাসী না হলেও আল্লাহ্ পাকের দরবারে সে অবিশ্বাসীদেরই তালিকাভুক্ত।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় ঃ আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের

দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত—এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন কোন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا (তিনিই সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাদের উপকারার্থ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।) এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণিজগত সমভাবে এদ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে! কেননা, মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পত্র, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্ট—কোন বস্তুই অনর্থক বা অহেতুক নয়ঃ বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না—চাই সে উপকার ইহলৌকিক হোক বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার অবদান উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, সেগুলোও কোন-না-কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্দ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ্ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ

করেন যে, আল্লাহ্ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে; আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই সে সব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সে সব বস্তুর অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

বস্তুজগতে দ্রব্যাদির ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ, না নিষিদ্ধ ঃ কোন কোন মনীষী এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, শরীয়ত যেসব বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, সেগুলো ছাড়া মানুষের জন্য যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ ও শরীয়ত-সিদ্ধ। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই সেগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কোন বস্তুর ব্যবহার কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে হারাম বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা হালাল বলেই বিবেচিত হবে।

অপরপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বস্তুজগতের সৃষ্টি যে মানুষের উপকারার্থ হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলোর ব্যবহারও তাদের জন্য হালাল (বৈধ)। জগতের যাবতীয় বস্তু মূলগতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে কোন বস্তুর ব্যবহার বৈধ বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ বা হারাম বলেই বিবেচিত হবে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান (র) তফসীরে বাহ্রে মুহীতে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত কোন মতের পক্ষেই এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা চলে না। কারণ, خَلَقَ لَكُمْ বাক্যে لام 'লাম' বর্ণটি 'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ,—এসব বস্তু তোমাদের কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতকে কোন বিষয়ের সিদ্ধতা (جائز) বা নিষিদ্ধতার (حرام) দলীলরূপে দাঁড় করানো যায় না। বরং কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে যেসব বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোরই অনুসরণ করা আবশ্যক।

উল্লেখিত আয়াতে ثُمَّ শব্দের দ্বারা পূর্বে পৃথিবী ও পরে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এটাই সঠিক। সূরা আন্নাযে'আতে বর্ণিত وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا —(অতঃপর তিনি ভূমণ্ডল বিস্তীর্ণ করেছেন) আয়াত